শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিক সময়ের কতিপয় চালচিত্র

তারিখ 16 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আহম্মেদ জামিল

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কার, নকল করতে সহায়তা করার জন্য জনৈক শিক্ষকের দু'বছরের কারাদণ্ড, কতিপয় নকলবাজ ছাত্র কর্তৃক মাওরা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পায়ের রগকাটা এবং শিক্ষকদের দলাদলির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'টি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে বন্দুক যুদ্ধ। এসব হলো আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কতিপয় ঘটনাবলীর চালচিত্র। এসব কিছু যে অশুভ ও দুঃখজনক তা বলাবাহুল্য। উল্লেখিত ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও এসবের উৎস কিন্তু এক ও অভিন্ন। আমাদের ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা এবং এর ফলে সৃষ্ট নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বাস্তব প্রতিফলন এসব কিছু। কেননা শিক্ষাজগত সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কেননা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা এবং চলমান ঘটনা ধারার প্রতিক্রিয়া শিক্ষাঙ্গনগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর এর প্রভাব কম বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে।

যা হোক, এসব কারণে আমাদের উচ্চশিক্ষা হতে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ করছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

প্রথমে দৃষ্টিপাত করা যাক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে। গত ৬ তারিখ হতে দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ৪ দফা দাবিতে রাজধানী ঢাকায় এসে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট করেন। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ, সরকারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকদের মাসিক ভাতা পনেরো শ' টাকা প্রদান, অরেজিস্ট্রেশনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং প্রতি বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষককে সরকারী ভাতা প্রদান। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের ওই দাবিসমূহকে কখনই অযৌক্তিক বলা যাবে না। শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আর প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার মূলভিত্তি। এই ভিত্ যদি মজবুত না হয়, দুর্বল থেকে যায় তাহলে আগামীদিনে দেশ বঞ্চিত হবে যোগ্য নাগরিক হতে। শিক্ষকরা সব সময় অভাব অনটনের মধ্যে থাকলে এবং প্রতিদিন যদি তাদেরকে দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তাদের কাছ হতে ভাল শিক্ষাদান কিভাবে আশা করা যায়? সভ্য মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই শিক্ষকদের প্রকৃত মর্যাদা দান সম্ভব। এই পরিবেশই একজন শিক্ষকের কাছ হতে ভাল পারফরমেন্স আশা করা যেতে পারে। আর তা না করে, কেবল 'শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর' কিংবা 'শিক্ষকতা হলো মহৎ পেশা' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করলে শিক্ষকের পেট ভরবে না। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৫২৮২৩টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার ৭৫০টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫১১৫টি। তন্মধ্যে ৬২৮০টি স্কুলই রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত। অর্থাৎ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অথচ এসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরাটসংখ্যক শিক্ষক পেশাগত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে। যদিও সরকার আগামী দু'হাজার সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার এবং পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারীকরণের কথা বলছে। কিন্তু এসবের কোন বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। যদিও সরকার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অনুদান বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছে। অতীতেও বহুবার শিক্ষকদের এ ধরনের বিভিন্ন আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রতিশ্রুতিসর্বস্বই থেকে গেছে। এবারেও যে এমনটি হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা প্রদান না করার এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে মেধাবী ও যোগ্য লোক এই পেশায় আসতে চাচ্ছেন না বা পারছেন না। মাধ্যমিক স্তরেও ওই একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলসহ কোন কোন মফস্বল শহরে দেখা যাবে এসএসসি হতে ডিগ্রী পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগে পাস করে অন্য কোন পেশায় চান্স না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে অনেকে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করছেন। শুধু তাই নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন এমন কেউ কেউ শিক্ষকতার পেশা বেছে নিচ্ছেন, যাদের অনেকেরই বেসিক এডুকেশন দুর্বল রয়ে গেছে।

খবরে প্রকাশ, গত বছর সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামের একটি সরকারী হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়। যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রেকর্ড ভাল। এদের মধ্যে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীও ছিলেন। কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় এরা ভাল করেননি। বেশ কিছু বানান এরা ভুল লিখেছেন। ব্যাকরণের ত্রুটি ছিল তাদের লেখায়। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর সাধারণ জ্ঞানের অভাব প্রকটভাবে ধরা পড়ে। এরা নিজ দেশ সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন না। যা হোক, এসব অযোগ্য লোকের অনেকেই শিক্ষকের আসনে বসছেন। সর্বত্র বন্টন সঙ্কটের কারণে শ্রেণী ব্যবধান দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে। যে কারণে ভাল স্কুল কলেজ ভাল শিক্ষক কয়েকটি বড় বড় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা। অবশ্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে। এ কারণে ভাল রেজাল্ট এবং মেধা তালিকায় স্থান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বিশেষ কয়েকটি স্কুল কলেজ এবং বিত্তবান শ্রেণী হতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অতি সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা এই তালিকায় প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। শুধু তাই নয়, পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নত পাঠ্যসূচী ছাড়া ভাল শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গলদ খুঁজে বের করে তার সমাধান ছাড়া সুসম ও সর্বজনীন শিক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের শিক্ষার ভিত্ দুর্বল থাকায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে চাকরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও। এ কারণে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজী বিষয়সহ ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর পরীক্ষার সময় বহু ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষার হলে অনেককে খাতা-কলম ফেলে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা গেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের। এসব ছাত্র-ছাত্রীর এহেন দুরবস্থার জন্য শুধু তাদেরকে একতরফাভাবে দায়ী করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। এদের অভিভাবক ও শিক্ষকরাও এজন্য কম বেশি মাত্রায় দায়ী। অধিকাংশ অভিভাবক খোঁজ-খবর রাখেন না, তাদের ছেলে-মেয়েরা ঠিকমতো পড়ালেখা করছে কিনা। বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটা বড় অংশই নিয়মিত ক্লাস নেন না কিংবা ক্লাসে সঠিকভাবে পাঠদান করেন না। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে অনেক শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন। অনেকে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তৈরি নোট বিক্রি করেন। আর সবচাইতে লজ্জাজনক ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো পয়সার বিনিময়ে শিক্ষক নামধারী কিছু কুলাংগার অবৈধভাবে কোন কোন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকে পাস করান কিংবা নকলের সুযোগ করে দেন। গত ৯ আগস্ট নীলফামারীর ডিমলা কলেজে জনৈক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে নকল করায় সহায়তাকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাইয়ুম সরদার একজন শিক্ষককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং তাকে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ ধরনের ঘটনা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অহরহ ঘটছে। মনে হয় যেনতেন প্রকারে পয়সা আয়ের ফন্দিফিকির সমাজের অন্যসব পেশার কিছু মানুষের মতো আমাদের শিক্ষকদের একটা অংশও বের করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্য দশটি পেশার মতো শিক্ষকতার পেশাকেও কালিমা লিপ্ত করছেন কিছুসংখ্যক শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতির প্রবল প্রতাপ বিরাজ করছে, তা থেকে শিক্ষক সমাজের সবাই যে মুক্ত থাকবেন তা কিভাবে আশা করা যায়? শিক্ষকের দুর্নীতির সাথে সাথে শিক্ষার্থীও দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ছে। স্বয়ং মানুষ গড়ার কারিগর যখন অমানুষ হন, তখন তার সৃষ্টিও অন্য কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটা অংশ মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আক্রান্ত। এদের কারণে গোটা শিক্ষা জগতে বিরাজ করছে অশুভ প্রবণতা। এই অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে কোন সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক যদি রুখে দাঁড়ান কিংবা তা বন্ধ করতে চান, তাহলে তাঁকে নানাভাবে অপমানিত হতে হয়। এমনকি শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত হতে হয়। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় এমনি একটি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। গত ৭ আগস্ট ইংরেজী প্রথম পত্র পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে মাওরা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বহিষ্কৃত হয় বেশ কিছু নকলবাজ পরীক্ষার্থী। এসব বহিষ্কৃত নকলবাজ পরীক্ষার্থীর কয়েকজন ঐ দিন সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ মাহতাবের বাসভবনে প্রবেশ করে তাঁর পায়ের রগ কেটে দেয়। ছাত্র নামধারী এসব দুর্বৃত্তের হাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতোপূর্বেও বহু আদর্শবাদী শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। দু'এক জনের প্রাণনাশও করা হয়েছে। সমাজে বিদ্যমান নৈতিক অবক্ষয় তরুণ প্রজন্মের গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে। বিচ্ছিন্ন ও অতি আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাসম্পন্ন তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই মানুষের অবয়বের আড়ালে তার পশুরূপ বেরিয়ে পড়ে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানবতা ও সমষ্টি চেতনাবোধ সৃষ্টি না করে তাদের মধ্যে পশুত্ব বোধ জাগিয়ে সংকীর্ণ কায়েমী ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করছে সমাজ ও রাজনীতির কর্ণধারদের কেউ কেউ। এভাবেই সম্ভাবনাময় একজন তরুণকে পরিণত করা হচ্ছে সন্ত্রাসীতে। শুধু সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্তারাই তরুণ প্রজন্মের কাউকে কাউকে সন্ত্রাসবাদী বানাচ্ছে তা নয়; এক্ষেত্রে শিক্ষক নামধারী কতিপয় ব্যক্তিও দায়ী। সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারাবন্দী মেধাবী তরুণ গোলাম ফারুক অভি এরশাদের শাসনামলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল। সে সময় পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দীতে অভি বলেছিল, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনা সৃষ্টিতে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক প্ররোচিত ও উৎসাহিত করে। কয়েকজন শিক্ষক তাকে এমনও অভয় দিয়েছিলেন যে, পুলিশ তাকে কিছু করতে পারবে না।